১১

ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব ইউরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এ বিপ্লব ইউরোপের পুরাতন সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয় এবং এক নতুন যুগের সূচনা করে। এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, ধর্মীয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সবার সমান অধিকারের ধারণা। পরবর্তীকালে এ বিপ্লবের প্রভাব প্রথমে ইউরোপ ও পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শসমূহ বর্তমান সময়েও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। অতএব স্বাভাবিক কারণেই এ বিপ্লবের কারণ ও অর্জন সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিপ্লবের কারণগুলো নিহিত ছিল বিপ্লব-পূর্ববর্তী অর্থাৎ পুরাতন শাসন আমলের (Old বা Ancient Regime) রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং বুদ্ধিজীবীদের লেখনীর মধ্যে। অতএব এ ইউনিটের পাঠগুলোতে ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পটভুমি আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বিপ্লব-পূর্ববর্তীকালের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি এবংসে সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-

- *পাঠ-১: রাজনৈতিক পটভূমি;*
- *পাঠ-২: আর্থ-সামাজিক পটভূমি;*
- *পাঠ-৩: বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি;*

পাঠ - ১

রাজনৈতিক পটভূমি

এই পাঠ শেষে আপনি -

- বিপ্লব–পূর্ব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- রাজার স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ছিল ফ্রান্সের বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ফ্রান্সেও মধ্যযুগে রাজা ছিলেন দুর্বল। কেননা রাজার হাতে যেসব ক্ষমতা থাকার কথা ছিল তার অনেকটা ছিল রোমান ক্যাথলিক গির্জা এবং দেশের বিভিন্ন অংশের সামন্তপ্রভুদের হাতে। কিন্তু আধুনিক যুগের শুরুতে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দেশের সামগ্রিক ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে, রাজশক্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় রাজা চতুর্দশ লুই ঘোষণা করেন 'I am the state' অর্থাৎ "আমিই রাষ্ট্র।" অনুরূপভাবে এ বংশের শেষ রাজা ষোড়শ লুই দাবি করেন "আমি যা করি তাই আইন।'

রাজার হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত

রাজা ছিলেন একাধারে কার্যনির্বাহী এবং বিচার বিভাগের প্রধান এবং একমাত্র আইন-প্রণেতা। কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে (অর্থাৎ মন্ত্রী, দূত, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার) নিয়োগ দান করতেন। যুদ্ধ ও চুক্তি স্বাক্ষরসহ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সকল সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল। তিনি ছিলেন বিচার বিভাগেরও প্রধান। সে হিসেবে তিনি বিচারকদেরকে নিয়োগ দিতেন এবং যে কোন বিচারকার্য সম্পন্ন করতে বা অন্য বিচারক কর্তৃক দেয়া রায় পরিবর্তন করতে পারতেন। অনুরূপভাবে তিনি ছিলেন দেশের একমাত্র আইন প্রণেতা। ইংল্যান্ডের ন্যায় ফ্রান্সে কোন পার্লামেন্ট বা সংসদ ছিল না। সুতরাং, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজার ছিল প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতা। জনগণের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্বের সবটাই রাজার প্রাপ্য ছিল। এ থেকে রাজা ইচ্ছামত রাজদরবার, রাজ পরিবার ও প্রশাসনের ব্যয় নির্বাহ করতেন। তত্ত্বগতভাবে নিজের ইচ্ছায় কর ধার্যের অধিকার তাঁর ছিল। ষোড়শ লুই তাঁর আত্মজীবনীতে দাবি করেন, "Kings are absolute masters and as such have a natural right to despose of everything belonging to their subjects." "রাজারা হচ্ছেন সর্বময় প্রভু যেমন প্রজাদের সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করার সকল প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে।" সব কিছুকে কর্তৃত্ব করার স্বাভাবিক অধিকার তাদের আছে।

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের অভাব

এতসব ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজা দেশের কারোর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। কেননা তিনি সৃষ্টিকর্তা থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতায় (Divine Right Monarchy) বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ তার সকল ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তার দেয়া এবং অতএব পৃথিবীতে কারোর কাছে জবাবদিহি করার প্রয়োজন তাঁর নেই, একমাত্র সৃষ্টি কর্তার কাছে তিনি দায়ী ছিলেন। পঞ্চদশ লুই বলেছিলেন "A king is accountable for his conduct only to God." এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে জনগণের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। অর্থাৎ রাজার কোন কাজের সমালোচনা করার বা রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার তাদের ছিল না। কেউ রাজশাসনের সমালোচনা করলে ''লেত্রী দ্য কেশে" (Letters de cachet) নামক পরোয়ানা জারি করে তাকে গ্রেফতার করা হতো এবং বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল তাকে সাধারণত বাস্তিলের জেলখানায় (যা এককালে একটি দুর্গ ছিল) আটক রাখা হতো। এ জন্যে বাস্তিলের জেলখানাকে দেশবাসী স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক বলে বিবেচনা করত। স্টেটস জেনারেল নামে দেশে একটি প্রতিনিধি সভা ছিল। কিন্তু ১৬১৪ সালের পর এ সভার কোন অধিবেশন ডাকা হয় নি। ঐতিহাসিক শেভিল যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বন্ধ থাকার ফলে সাধারণমানুষের অসুবিধা ও অভিযোগের কথা রাজার নিকট পৌঁছানো সম্ভব হতো না। রাজার পক্ষেও দেশের সাধারণ প্রজার অবস্থার কথা জানা সম্ভব হতো না। এর ফলে বুরবোঁ রাজতন্ত্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েপড়ে।" প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখের প্রয়োজন যে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই সমকালীন "প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রী" শাসনের মতবাদ গ্রহণ করেন নি।

দেশে প্রকৃত ঐক্যের অভাব

কিন্তু আইনত রাজা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাঁকে নির্ভর করতে হতো রাজ পরিষদ, মন্ত্রী ও অগণিত প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপর। তাছাড়া এক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শাসন প্রচলিত থাকলেও অনেক দিক থেকে দেশে প্রকৃত ঐক্যের অভাব ছিল। কার্ডিন্যাল রিসেলিওর ১৫৮৫-১৬৪২ খ্রি) আমল থেকে প্রদেশের শাসনভার ছিল ইনটেনডেট নামক এক শ্রেণীর কর্মকর্তার হাতে। রাজার প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা ছিল না। কোনো কোন ক্ষেত্রে প্রদেশে সামন্ত প্রভুরা কিছু ক্ষমতা দাবি করতো। অপর পক্ষে কোনো কোনো শহর এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতো। দেশের সর্বত্র এক ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা, ওজন প্রণালী এবং কর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে পণ্য বহন করতে হলে শুল্ক প্রদান করতে হতো।

বিভিন্ন ধরনের আইন ও বিচার ব্যবস্থা

দেশের সর্বত্র এক ধরনের আইন প্রচলিত ছিল না। প্রকৃত পক্ষে বিপ্লবের অব্যবহিত আগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় তিন শতেরও বেশি আইন প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ কোথাও যা ছিল আইনসিদ্ধ অন্যত্র তা ছিল বেআইনি। বিচারকার্যেও অনুরুপ বিশৃঙ্খলা ছিল। মধ্যযুগে দেশে রাজকীয় কোনো আদালত ছিল না। সে সময়ে বিচারকার্য সম্পন্ন হতো সামন্ত আদালতে ও গির্জার আদালতে। পরবর্তীকালে রাজক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে সংগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় রাজকীয় আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি সামন্তপ্রভু ও গির্জা কর্তৃক পরিচালিত আদালতগুলো তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এসব আদালতের কর্তৃত্ব নির্ধারিত ছিল না। ফলে অনেক সময়

এগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিত। অতএব যদিও রাজা ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান এবং দেশের সর্বত্র রাজকীয় আদালত সর্বেসর্বা হওয়ার কথা ছিল, বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্ন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইর দুর্বলতা

চর্তুদশ লুইর রাজত্বকালে স্বৈরতন্ত্র চরমে পৌঁছলেও তাঁর আমলে শাসন ব্যবস্থা ছিল উন্নত। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করার ফলে তিনি ফরাসি জাতির আনুগত্য লাভ করেন। কিন্তু আঠারো শতকের ফ্রান্স ছিল অকর্মণ্য রাজা পঞ্চদশ লুই, ডিউক অব অরলিয়েন্স, ম্যাডাম প্যাম্পাডোর, দুর্বল-চিত্তের ষোড়শ লুই এবং তাঁর বিলাসপ্রিয় স্ত্রী মারিয়া আঁতোয়া কর্তৃক শাসিত। ঐতিহাসিক শেভিলের ভাষায় পঞ্চদশ লুই ছিলেন 'প্রজাপতি রাজা' (Butterfly monarch)। তিনি আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতেন। তাঁর স্থায়ী উপপত্নী ম্যাডাম প্যাম্পাডোর রাজার দুর্বলতার সুযোগে প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতেন। ফলে প্রশাসন ক্রমে ক্রমে অনেকটা রাজার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। ষোড়শ লুই ছিলেন সৎস্বভাবের লোক, কিন্তু তাঁর চরিত্রে কোন দৃঢ়তা ছিল না। তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী (অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার কন্যা) মারিয়া আঁতোয়ার প্রভাবাধীন। পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় দেখা যাবে ষোড়শ লুই তাঁর স্ত্রী ও স্বার্থান্বেষী মহলের চাপে রাজতন্ত্র ও দেশের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন।

ব্যর্থ পররাষ্ট্রনীতি

পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই তাঁদের অদূরদর্শী বৈদেশিক নীতি দ্বারা ফ্রান্সের এবং রাজবংশের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেন। পঞ্চদশ লুইর শাসন আমলে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে (১৭৪০-৪৮ খ্রি.) এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রি.) লিপ্ত থাকে। এ দুটো যুদ্ধে ফ্রান্স শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। প্রচুর লোকবল ও অর্থের অপচয় ঘটে। তাছাড়া এ দুটো যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারত ও কানাডা থেকে ফরাসিরা বহিস্কৃত হয় এবং এ দুটো দেশে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়। সমুদ্র পথেও ফ্রান্স প্রাধান্য হারায়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের কাছে পরাজয় ফরাসি রাজতন্ত্রের মর্যাদাকে ভীষণভাবে ক্ষুন্ন করে। এ দুটো যুদ্ধে ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হলেও ষোড়শ লুই নিরস্ত হন নি। তিনি ফ্রান্সকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে দেন। ফলে রাজার অর্থ সংকট আরও তীব্র হয়।

অভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা

রাজার দুর্বলতার ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কেননা, এ সুযোগে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং বিচার ও কর বিভাগের ত্রুটি–বিচ্যুতিগুলো প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনত রাজা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তাঁকে নির্ভর করতে হতো রাজ পরিষদ, বিভিন্ন মন্ত্রী অগণিত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর উপর। রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজপরিষদ বিভিন্ন মন্ত্রীর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতো। মন্ত্রীদের মধ্যে কলহ লেগেই থাকতো। কেননা, তাদের কর্তৃত্বের সীমারেখা চিহ্নিত ছিল না। অনুরূপভাবে অগণিত রাজ কর্মচারীদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকতো। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ দেশের সর্বত্র কার্যকর হতো না। বিচারকার্যে চরম অবনতি ঘটে। বিচার যেমন ছিল ব্যয় সাপেক্ষও তেমনি ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন বিবেচনা না করে অনেক ক্ষেত্রে

বিচারকগণ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত ছিলেন। রিসেলিও, মাজারিন প্রমুখ সুদক্ষ শাসকদের আমলে অভিজাত শ্রেণী রাজশক্তির বশ্যতা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা আবার রাজসভায় এবং প্রাদেশিক প্রশাসনে প্রাধান্য বিস্তার করে। ইনটেনডেন্ট নামক প্রাদেশিক শাসনকর্তার রাজস্ব আত্মসাৎকারী "স্বার্থলোলুপ নেকড়ে বাঘে" পরিণত হয়েছিল। তারা অনেক বাড়তি কর আদায় করতো এবং আদায়কৃত করের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আত্মসাৎ করতো। এর পাশাপাশি ছিল অন্যান্য শ্রেণীর আমলাদের অযোগ্যতা ও দুর্নীতি। এভাবে রাজার দুর্বলতার কারণে স্বেচ্ছাচারী শাসনের সকল দোষ-ত্রুটি প্রকট হয়ে উঠে এবং রাজতন্ত্র জাতিকে শাসন করার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। রাজা কোনো নতুন আইন জারি করলে তা প্যারিস পার্লম নামক বিচার সভায় রেজিস্ট্রি করতে হতো। কিন্তু এর সদস্যরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর। যতদিন রাজতন্ত্র শক্তিশালী ছিল ততোদিন পার্লমঁ তেমন অবাধ্য হয়নি। কিন্তু বিপ্লবের প্রাক্কালে এ সভা রাজার বিরোধিতা করে।

অতএব বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের রাজতন্ত্র থেকে ফরাসি রাজতন্ত্র দুদিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। **প্রথমত,** তত্ত্বগতভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে রাজা ছিলেন দুর্বল। **দ্বিতীয়ত,** রাজকোষে দারুণ অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল। অর্থসংকটের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অর্থাভাব দূর করার জন্যেই রাজা ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করতে বাধ্য হন, আর এ অধিবেশনই ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে।

সারসংক্ষেপ

স্বেচচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ছিল বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাজা ছিলেন বিচার, শাসন, আইন ও অর্থ বিভাগের প্রধান। কিন্তু প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে, রাজ ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত। অতএব, পৃথিবীর কারোর কাছে রাজা জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল না। রাজা যতদিন দক্ষতার সংগে দায়িত্ব পালন করেছিলেন ততোদিন ফ্রান্সের মানুষ তাঁর স্বেচ্ছাচারী শাসন মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ ও যোড়শ লুই অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তাছাড়া তাঁদের শাসন আমলে দারুন অর্থাভাব দেখা দেয়। এভাবে বুরবোঁ রাজবংশ দেশের শাসন কার্য চালানোর নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে কত ধরনের আইন প্রচলিত ছিল?

(ক) ৩০০ এর বেশি (খ) ২৫০ এর বেশি

(গ) ২২৫ এর বেশি (ঘ) ২০০ এর বেশি

২। কোন বুরবোঁ রাজাকে "প্রজাপতি রাজা" বলা হতো?

(ক) ষোড়শ লই (খ) ত্রয়োদশ লুই

(গ) পঞ্চদশ লুই (ঘ) এদের কেউ নন

৩। ১৭৮৯ সালের আগে কত সালে ষ্টেটস জেনারেলের শেষ অধিবেশন বসেছিল?

(ক) ১৬১০ সাল (খ) ১৬১১ সাল

(গ) ১৬১৩ সাল (ঘ) ১৬১৪ সাল

৪। কোন শ্রেণীর শাসনকর্তারা "স্বার্থ লোলুপ নেকড়ে বাঘ" বলে পরিচিত ছিল?

(ক) বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণ (খ) প্রাদেশিক শাসনকর্তারা

(গ) রাজস্ব বিভাগের শাসনকর্তারা (ঘ) এদের কেউ নন।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজার ক্ষমতার বিবরণ দিন।

২। পঞ্চদশ ষোড়শ লুই-র শাসন আমলের ব্যর্থতা আলোচনা করুন।

গ. সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন

১। বিপ্লবের প্রাক্কালে অভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তার বিবরণ দিন।

২। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (ক) ২। (গ) ৩। (ঘ) ৪। (গ)

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Robert Ergang, Europe From Renaissance to Waterloo
2. C. I. H Hayes, A Political and Cultural History of Modern Europe
3. W. L. Langer, The Rise of Modern Europe
4. G. Lefebre, The Coming of the French Revolution

পাঠ - ২

আর্থ-সামাজিক পটভূমি

এই পাঠ শেষে আপনি

- পূর্বতন আমলে যাজক ও অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বর্ণনা দিতে পারবেন
- শহূরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন

বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্স ছিল সবচেয়ে জনবহুল। কিন্তু ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল নানা দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

তিনটি সম্প্রদায়

ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফ্রান্সের সমাজ বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত (Privileged) এবং অধিকারহীন (Unprivileged) এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অধিকারপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তর্ভুক্ত ছিল যাজক (Clergy) ও অভিজাত সম্প্রদায় (Nobility)। যাজকরা প্রথম (First Estate) এবং অভিজাতরা দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের (Second Estate) অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিকারহীন গোষ্ঠী ছিল যাজক ও অভিজাত ব্যতীত সমাজের অন্যান্য স্তরের অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায়ের (Third Estate) মানুষ নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শহূরে উচ্চ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শহরের সাধারণ মানুষ বা ভাসমান জনতা (সাঁকুলাত), ধনী কৃষক, ক্ষেত মজুর ও বর্গাদার।

যাজক সম্প্রদায় ও তাদের সুযোগ-সুবিধা

১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে যাজকদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার সামান্য অংশ। যাজক গোষ্ঠী দুটো অংশে বিভক্ত ছিল, যথা, উচ্চ যাজক ও নিু যাজক। কার্ডিন্যাল, আর্চবিশপ, বিশপ ও এবাট ছিল উচ্চ যাজকদের দলে। গ্রামের পাদরিরা ছিল নিম্নস্তরের যাজক। যাজক সম্প্রদায় অনেক ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। দেশের মোট ভূ-সম্পত্তির শতকরা ২০ ভাগের মালিকানা ছিল গির্জা বা যাজকদের হাতে, কিন্তু এ ভূ-সম্পত্তির জন্য সরকারকে কোনো কর বা তেই (Taille) দিতে হতো না। অন্যান্য কর পরিশোধ থেকে তারা আংশিক ও সম্পূর্ণ অব্যাহতি ভোগ করত। অপরপক্ষে গির্জা বা যাজক শ্রেণী কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ বা টাইদ (Tithe) বা ধর্মকর হিসেবে আদায় করতো। এছাড়া তারা কৃষকদের কাছ থেকে মৃত্যু কর ও নামকরণ কর আদায় করার অধিকার পেয়েছিল। এ ভাবে যাজক সম্প্রদায় একটি বিত্তশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। ফরাসি মন্ত্রী নেকারের মতে বিপ্লবের প্রাক্কালে গির্জার বার্ষিক আয় ছিল ১৩ কোটি লিভর। অবশ্য গির্জার আয়ের সিংহভাগ উচ্চ যাজকরাই ভোগ করতো। ফলে নিম্নস্তরের যাজকদের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৭৮৯ সালে এরা অনেকেই প্রথম দিকে বিপ্লবীদের সংগে যোগদান করে।

অভিজাতদের প্রকারভেদ

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল অভিজাতবর্গ। এরা ছিল সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ। আঠারো শতকের শেষ দিকে অভিজাতরা কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অভিজাতদের উচ্চতর গোষ্ঠী ছিল রাজার সভাসদ, সেনাপতি, বিচার বিভাগের উচ্চ পদের এবং ইনটেনডেন্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করতো। অভিজাতদের আর একটি গোষ্ঠীকে গ্রাম্য অভিজাত বলা হতো। এরা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করতো। এদের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি শোষণের সম্পর্ক ছিল। এ দু'টো গোষ্ঠীর অভিজাতরা অসিধারী অভিজাত (Nobility of the sword) নামে পরিচিত ছিল। এরা ছিল বনেদী বা নীল রক্তবান অভিজাত। এছাড়া আর একটি অভিজাত গোষ্ঠী ছিল যাদের নীল রক্ত ছিল না। এরা ছিল চাকুরীজীবী অভিজাত বা পোষাকী অভিজাত (Nobility of the Robe)। এরা প্রশাসক, আইনবিদ ও বিচারকের কাজ করতো।

অভিজাতদের সুযোগ-সুবিধা

যাজকদের ন্যায় অভিজাত সম্প্রদায়ও কতগুলো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। এরা বংশ কৌলিণ্যের জোরে সরকারি উচ্চ পদগুলোতে একচেটিয়াভাবে নিয়োগের অধিকার পেয়েছিল। সামন্ত প্রভুরা ফ্রান্সের কৃষি জমির শতকরা ২০ ভাগের মালিক ছিল, কিন্তু তারা ভূ-কর আদায় করতো না। এ ছাড়া কাঁপিতাশিঁয় (Capitation) এবং ভ্যাঁতিয়াঁমী নামক অন্য দুটি কর আদায়ও তারা নানা অজুহাতে আংশিক বা সম্পূর্নভাবে এড়িয়ে যেতো। এরা রাজার সভাসদ হিসেবে ভাতা, পুরস্কার ও পেনশন পেতো। সমাজে এরা ছিল সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন। তাছাড়া অভিজাত গোষ্ঠী তাদের জমিদারীতে কতগুলো সামন্ত অধিকার ভোগ করত। এ সব অধিকার পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় সম্প্রদায়

যাজক ও অভিজাতরা ব্যতীত ফ্রান্সের আর সবাই ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। আঠারো শতকের শেষার্ধে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটি। এর শতকরা ৯৬ ভাগ ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ অধিকারবিহীন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী, কৃষক ও শহরের শ্রমিক। বুর্জোয়া শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত ছিল ব্যাংকের মালিক, দালাল, শিল্পোৎপাদক, বণিক, ম্যানেজার. আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিল্পী, গ্রন্থকার এবং বার্তাজীবী।

বুর্জোয়া শ্রেণী

তৃতীয় সম্প্রদায়ের উচ্চস্তরের সদস্যদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী। এরা অনেকেই যাজক ও অভিজাতদের তুলনায় অনেক বেশি বিত্তশালী এবং শিক্ষিত ছিল। এ ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী লক্ষ্য করে যে দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে অভিজাত এবং যাজকদের তেমন কোন অবদান নেই। অথচ তারা বংশানুক্রমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো সুযোগ-সুবিধা, রাজনৈতিক অধিকার ও সমাজিক মর্যাদা ভোগ করছে। অতএব দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনায় অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিতে দেশের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ছিল বৈষম্যপূর্ণ। তারা এ বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে এমন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয় যেখানে তাদের মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃতি পাবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা, বংশগত না হয়ে প্রকৃত যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল হউক– এ ছিল তাদের দাবি। এছাড়া তারা চেয়েছিল এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে

সরকারের নিয়ন্ত্রন থাকবে না। প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর অসন্তোষ ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ।

কৃষক সমাজ

কৃষকদের মধ্যে নানা ভাগ ছিল। এদের এক অংশ ছিল স্বাধীন কৃষক। এরা নিজ মালিকানাধীন জমি চাষ করতো। কিন্তু এদের বেশির ভাগের পরিবার-প্রতি জমির পরিমান কম ছিল। কৃষকদের মধ্যে একটি অংশ ছিল প্রজা যারা অন্যের জমি খাজনা বা ভূ-কর দিয়ে চাষ করতো। এছাড়া ছিল ক্ষেত মজুর, বর্গাদার ও ভূমিদাস। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে ভূমিদাসের সংখ্যা ছিল আনুমানিক দশ লাখ। এদেরকে সপ্তাহের কয়েকদিন বিনা পারিশ্রমিকে সামন্ত প্রভুদের জন্যে কাজ করতে অর্থাৎ বেগার খাটতে হতো।

কৃষকদের অসন্তোষ

বিপ্লবের প্রক্কালে ফরাসি কৃষকদের অবস্থা সামগ্রিকভাবে ভালো ছিল না। কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশের কৃষকদের এবং বিগত শতকে ফ্রান্সের কৃষকদের অবস্থার চেয়ে তাদের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। একথা বিশেষভাবে সত্য ছিল শুধু মাত্র যে সব কৃষক নিজের মালিকানাধীন জমি চাষ করতো তাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু অভিজাত ও যাজকদের বিরুদ্ধে এদের ছিল তীব্র অসন্তোষ। এ অসন্তোষের প্রধান কারণ ছিল এই যে সামন্ত প্রভুকে ভূ-কর দিতে না হলেও এসব কৃষককে অভিজাত গোষ্ঠী অনেক উপায়ে শোষণ করতো। যেমন যখন কোন কৃষক উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিকানা পেতো তখন সে সামন্ত প্রভুকে নির্দিষ্ট পরিমান টাকা ফি হিসাবে দিতে বাধ্য থাকতো, জমি বিক্রি করলে জমির মূল্যের একটি অংশ সামন্ত প্রভুকে দেয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এছাড়া কৃষকদেরকে সামন্ত প্রভুর চুল্লিতে পাউরুটি আর মদ তৈরির কারখানায় মদ তৈরি করতে এবং এজন্যে পণ্যের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য করা হতো। মধ্যযুগে অভিজাতরা প্রশাসনিক বিচার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক দায়িত্ব পালন করতো, এর পরিবর্তে তারা কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় এ সব দায়িত্ব গ্রহণ করে ছিল সরকার। কিন্তু সামন্ত প্রভুদের সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকে। তাই কৃষকদের দৃষ্টিতে এসব সুযোগ-সুবিধার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। তাদের মতে এগুলো ছিল নিতান্তই শোষণের অধিকার।

শহরের শ্রমজীবী মানুষ

তৃতীয় সম্প্রদায়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল শহরের শ্রমিক। শ্রমজীবী বলতে কেবল শহরের কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদেরকেই বুঝাত না। শ্রমজীবী বলতে বুঝাত কারখানার শ্রমিক, রুটি প্রস্তুতকারক, কসাই, মদ প্রস্তুতকারক, মুদী, রাজমিস্ত্রী, দোকানদার, সরাইখানার মালিক, ধোপা, নাপিত, স্বর্ণকার, পুস্তক বিক্রেতা প্রভৃতি অনেককে। এরা সাঁকুলাৎ নামে পরিচিত ছিল। আঠার শতকের শেষার্ধে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু মজুরীর হার তেমন বৃদ্ধি পায় নি; ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে উঠে। ১৭৮৮ সালে ফসল হানি ঘটলে খাদ্য দ্রব্যের দাম আরও বেড়ে যায়। গ্রামের নিরন্ন মানুষ শহরে চলে আসে। ফলে সাঁকুলাতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সাঁকুলাতদের অভাব-অভিযোগ বিপ্লবের একটি বড় কারণ।

অর্থনৈতিক অবস্থা

বিপ্লব-পূর্ববর্তী যুগে ফ্রান্স ছিল একটি কৃষি প্রধান দেশ। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান তখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। অর্থনৈতিক অবস্থার অপর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল বৈষম্যপূর্ণ কর ব্যবস্থা এবং কর আদায়ে দুর্নীতি। এর ওপর ছিল যুদ্ধের খরচ, সরকারি অপব্যয় এবং রাজ পরিবারের অমিতব্যয়িতা। এসবের ফলে বিপ্লব পূর্ববর্তী কালে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায়। এছাড়া বণিকদের প্রভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেক ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ব্যবস্থা ছিল উঠতি বুর্জোয়াদের স্বার্থের পরিপন্থী।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করসমূহ

এসময়ে ফ্রান্সে তিন ধরনের প্রত্যক্ষ কর আদায় করা হতো। এগুলো ছিল তেই (ভূ-সম্পত্তির ওপর ধার্য কর), কাপিতাশিয়ঁ (উৎপাদন ভিত্তিক আয়কর) এবং ভ্যাঁতিয়াঁস (স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ওপর কর)। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সামন্ত প্রভু এবং যাজক সম্প্রদায় এসব কর পরিশোধ থেকে পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি ভোগ করতো। অর্থাৎ বলা চলে যে, একমাত্র কৃষকদেরকেই এসব কর পরিশোধ করতে হতো। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে, কৃষকদের কাছ থেকে ধর্ম যাজক ও সামন্ত প্রভুরা বিভিন্ন কর আদায় করতো। প্রত্যক্ষ করের পাশাপাশি সরকার অনেক প্রকার পরোক্ষ করও আদায় করতো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল গাবেল (Gabelle) বা লবণকর এবং এদ (Aide) বা ভোগ্যবস্তুর ওপর ধার্য কর। এসব কর আদায়ের ভার সরকার এক ধরনের কর আদায়কারীর ওপর ন্যস্ত করেছিল। এর ফলে একদিকে যেমন করদাতাদের ওপর অত্যাচার বেড়ে যায়, অপরপক্ষে সরকারের বিপুল রাজস্ব কমে যায়। অর্থাৎ রাজা দু'দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এভাবে বিচার করলে বলা যায় যে, আঠার শতকের শেষার্ধে অর্থাৎ পূর্বতন শাসন আমলে ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নানা দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং এক পর্যায়ে বিপ্লবের মাধ্যমে এ অসন্তোষের বহি:প্রকাশ ঘটে।

সারসংক্ষেপ

বিপ্লবের প্রাক্কালে অন্যান্য দেশের ন্যায় ফ্রান্সের জনগোষ্ঠী তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যাজকরা ছিল প্রথম সম্প্রদায়, অভিজাতগণ দ্বিতীয় সম্প্রদায় এবংবাকি অংশ ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথম দুটো সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী ছিল বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত, অর্থাৎ তারা দেশের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তৃতীয় সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী এসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল বলে তারা অধিকারহীন দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল বৈষম্যপূর্ণ। এ বৈষম্য বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মন দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। অপরদিকে কৃষকদের মধ্যেও অভিজাতদের সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। এ ক্ষোভ এবং তজ্জনিত কারণে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিপ্লবের অবিজাত সম্প্রদায় ফ্রান্সের কি পরিমাণ জমির মালিক ছিল?

(ক) শতকরা ১০ ভাগ (খ) শতকরা ১৫ ভাগ

(গ) শতকরা ২০ ভাগ (ঘ) শতকরা ২২ ভাগ

২। নেকারের মতে বিপ্লবের প্রাক্কালে গির্জার বার্ষিক আয় কত ছিল?

(ক) ১৩ কোটি লিভর (খ) ১৪ কোটি লিভর

(গ) ১৫ কোটি লিভর (ঘ) ১৭ কোটি লিভর

৩। বিপ্লবের প্রাক্কালে ভূমিদাসদের সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ৭ লাখ (খ) ৪ ৮ লাখ

(ঘ) ৯ লাখ (ঘ) ১০ লাখ

৪। বিপ্লব-পূর্ববর্তী যুগে ফ্রান্সে কত ধরনের প্রত্যক্ষ কর আদায় করা হতো?

(ক) ৫ ধরনের (খ) ৪ ধরনের

(গ) ৩ ধরনের (ঘ) ২ ধরনের

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিপ্লব-পরবর্তী যুগে যাজক ও অভিজাতরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো তা আলোচনা করুন।

২। বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষোভের কারণ কি ছিল?

৩। কৃষক সম্প্রদায়ের অসন্তোষের কারণগুলির বিবরণ দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। গ, ২। ক, ৩। খ, ৪। গ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. G. Lefebvre, The Coming of the French Revolution.
2. Robert Ergang, Europe from Renaissance to Watorloo
3. Salvenuin, The French Revolation, 1788-1792

পাঠ - ৩

বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিপ্লব পূর্ববর্তী ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং গির্জা সম্পর্কে ভলতেয়ার, মঁতেসকিয়ো এবং রুশোর সমালোচনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশ্বকোষ সংকলকদের বক্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী লেখকদের মতামত সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

আঠারো শতকের ফ্রান্সে একদল দার্শনিক ও চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটে। এরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে প্রচলিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষের কাছে তুলে ধরেন। এসব লেখকের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ভলতেয়ার, মঁতেসকিয়ো এবং রুশো।

মহামতি ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রি.)

ভলতেয়ার ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের তথা ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তি বা যুক্তির যুগের (Age of Enlightenment বা Age of Reason) শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ফ্রাঁসোয়া ম্যারি এ্যারাউয়্যে। তিনি ১৬৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৭৮ সালে মারা যান। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি নাটক, কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা প্রকার রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে Oedipe, Letters Philosophiques, Elements of Essays on Universal History, এবং Zodig ইত্যাদি. এসব লেখায় তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি অতি সহজ এবং অনেকক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় তুলে ধরেন। তিনি তাঁর লেখনীর জন্যে দু'বার কারাবরণ করেন এবং একবার ইংল্যান্ডে ও আর একবার প্রুশিয়ায় পালিয়ে যান। কিন্তু পূর্বতন আমলের সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনা করলেও এগুলো সংশোধনের জন্যে বিপ্লবের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল জ্ঞানদীপ্ত অথচ স্বৈরাচারী শাসনের মাধ্যমে এসব দোষ-ত্রুটির সংশোধন সম্ভব। অর্থাৎ তিনি ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনের প্রবক্তা।

গির্জা ও যাজকদের সমালোচনা

অবশ্য গির্জা ও যাজকদের সমালোচনায় তিনি প্রকৃতই বিপ্লবী ছিলেন। তিনি শত উপায়ে রোমান ক্যাথলিক গির্জা এবং যাজকদের স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা এবং দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন এবং এভাবে তাদের প্রতি মানুষের আস্থার ভিতকে দুর্বল করতে সাহায্য করেন। বিপ্লবের পথ সুগম করার ক্ষেত্রে এটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কেননা ধর্মের প্রতি মানুষের আস্থার অভাবের অর্থ ছিল এই যে, প্রচলিত সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পেছনে ধর্মের অনুমোদন বা সমর্থন রয়েছে এবং এর পরিবর্তন কামনা করা ধর্ম-বিরোধী কাজ হবে- এ ধারণার অবসান। এভাবে বিচার করলে

বলা যায় যে, তিনি বিপ্লবী না হলেও ফরাসি বিপ্লবের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। বিপ্লবের শুরুতে জাতীয়সংবিধান সভা যেসব সংস্কার প্রবর্তন করে তাতে ভলতেয়ারের ধ্যান-ধারণার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শার্লস মঁতেসকিয়ো (১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রি.)

বিপ্লব পূর্ববর্তী যুগের অপর এক বিখ্যাত লেখক ছিলেন মঁতেসকিয়ো। তিনি ১৬৮৯ সালের ফ্রান্সের এক সামন্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫৫ সালে মারা যান। তিনি প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন এবং সে দেশের সরকার পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রথম লেখা The Persian Letters. এ পুস্তকে তিনি উজবেক ও রিকা নামক দুইজন পারস্যদেশীয় ভ্রমণকারীর ছদ্মনামে ফরাসি সমাজের দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর দ্বিতীয় অবদান ছিল ছোট একটি পুস্তক– The Greatness and Decadence of the Romans মঁতেসকিয়োর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে The Spirit of Law.

মঁতেসকিয়োর বিশ বছরের পরিশ্রমের ফসল এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৪৮ সালে। মাত্র আঠারো মাসে পুস্তকটির ২২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে পুস্তকটি কত যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পুস্তকে তিনি দুটো প্রধান মতবাদ ব্যক্ত করেন। **প্রথমত,** কোনো দেশে কি ধরনের আইন বা সংগঠন (Institution) প্রচলিত থাকবে তা নির্ভর করে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঐতিহ্যের ওপর। **দ্বিতীয়ত,** জনগণ যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সেজন্যে সবকারের তিনটি বিভাগ (কার্য-নির্বাহী, আইন প্রণয়ণ এবং বিচার) পরাধীন থেকে স্বাধীন হওয়া অপরিহার্য। অর্থাৎ একটি বিভাগ অপর বিভাগের ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এর অন্যথা হলে জনগণ গনতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এ ধারণা ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্ব (Doctrine of the Separation of Powers) নামে পরিচিত। এভাবে মঁতেসকিয়ো ফ্রান্সে প্রচলিত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র এবং Divine Right Monarchy-এর ভিত্তিমূলে আঘাত করেন। মঁতেসকিয়োর দ্বিতীয় মতবাদটি দেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভলতেয়ার যেমন রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন মঁতেসকিয়ো তেমনি স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, 'যদি একই ব্যক্তির হাতে সরকারের আইন, বিচার ও কার্যনির্বাহী বিভাগ ন্যস্ত থাকে তবে রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবসান হবে।'

জ্যাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রি.)

জ্যাঁ-জাক রুশো ১৭১২ সালে জেনেভায় এক ঘড়ি প্রস্তুতকারকের ঘরে জন্মগহণ করেন। বাল্যকালে তিনি তাঁর মাতাকে হারান। তাঁর পিতাও তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান অন্যত্র। এভাবে স্নেহ-মমতার বন্ধন থেকে বিছিন্ন হয়ে তিনি কয়েক বছর ধরে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকায় ভবঘুরে হিসেবে জীবন যাপন করেন এবং এ সুযোগে সে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংস্পর্শে আসেন। এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং দেশের ছোট ছোট গ্রামে মানুষের সহজ সরল জীবন তাঁর চিন্তায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী কালে তিনি প্যারিসে চলে যান। এখানে ১৭৪৯ সালে তিনি সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের চরিত্র অধ:পতিত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। এভাবে লেখক হিসেবে রুশোর আবির্ভাব ঘটে। এরপর তিনি অনেক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখার মধ্যে সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে New Heloisie, Emile, Confession (তাঁর আত্মজীবনী) এবং Social Contract বা সামাজিক চুক্তি গ্রন্থ।

রোমান্টিক আন্দোলনের প্রবর্তন

রুশোর মূল বক্তব্য ছিল প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাওয়ার আহ্বান। সভ্যতার শুরুতে মানুষ যখন প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো তখন তাঁর জীবনে ছিল সুখ, শান্তি, প্রাচুর্য এবং সে ভোগ করতো সমান অধিকার। কিন্তু পরবর্তীকালে সভ্যতার অগ্রগতির সংগে মানুষ তার স্বাধীনতা ও সমান অধিকার হারায়। তাই তিনি 'সমাজিক চুক্তি' গ্রন্থের শুরুতেই উল্লেখ করেন 'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু তবু মানুষ সর্বত্রই শৃঙ্খলিত'। প্রকৃতির রাজ্যে যে সুখ-শান্তির কথা তিনি উল্লেখ করেন ঐতিহাসিকভাবে তা সত্য নয়। তাছাড়া আক্ষরিক অর্থে তিনি আদিম সভ্যতার যুগে ফিরে যাওয়ার কথাও বলেন নি। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে 'দুধ ও মধুর বন্যা' বয়ে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর উচ্ছাস এবং সেই কল্পিত স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্যে মানুষের ভাবাবেগ ও অনুভূতির প্রতি আবেদন চিন্তার জগতে এক নতুন প্রবণতার সৃষ্টি করে। সে প্রবণতা রোমান্টিক আন্দোলন (Romantic Movement) নামে পরিচিত। এখানেই ভলতেয়ারের সংগে রুশোর পার্থক্য। ভলতেয়ার ছিলেন যুক্তির পূজারী, আর রুশো ছিলেন ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী, আবেগ উচ্ছ্বাসের পূজারী ও কল্পনাবিলাসী। তাই বলা হয়েছে যে, রুশো শৃঙ্খলমুক্ত করেছেন অগণিত ভাবপ্রবণ ব্যাঘ্র, অন্যদিকে ভলতেয়ার 'সজ্জিত করেছেন যুক্তিপ্রবণ অশ্ব'।

সমষ্টিগত ইচ্ছা

ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম করার ক্ষেত্রে রুশোর অবদান সবচেয়ে বেশি। এ বিপ্লবের মূলমন্ত্র সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী তাঁর চিন্তাধারা থেকে নেয়া। তাঁর মতে রাষ্ট্রের জন্ম হয় একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। এ চুক্তি মোতাবেক প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'-এর (General Will) কাছে নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়। রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন হয় এজন্যে যে ক্রমে প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা জন্ম নেয় এবং তাদের মধ্যেসৃষ্টি হয় বৈষম্য। আর এর ফলে প্রতারণা ও অতৃপ্ত বাসনা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রাধান্য বিস্তার করে। 'সমষ্টিগত ইচ্ছার' কাছে নিজের অধিকার সমর্পণ করে মানুষ লাভবান হলো, কেননা সে এতে করে অন্যকে তার উপর যতটুকু ও যে ধরনের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ছিল, সে নিজেও ঠিক অন্যের ওপর ততটুকু এবংএকই জাতীয় কর্তৃত্ব করার অধিকার পায়। ফলে সে নিজের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে সমষ্টির বৃহত্তর শক্তির সহায়তা পায়। এভাবে যে রাষ্ট্রের জন্ম হয় তা প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। সিদ্ধান্ত হয় যে আইন-বিধি প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারাই প্রণীত হবে; সরকার হবে রাষ্ট্রের কার্য-নির্বাহী সংগঠন মাত্র। সরকারের দায়িত্ব হবে 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' বাস্তবায়িত করা, এ ইচ্ছা বিধিবদ্ধ করা নয়। এছাড়া জনগণ ইচ্ছামত সরকার গঠন করতে বা এর পতন ঘটাতে পারবে। অতএব জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। মানুষ যেহেতু ব্যক্তি-স্বাধীনতা হারিয়ে শাসক শ্রেণীর হাতে শৃঙ্খলিত হয়েছে সেহেতু সেই স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানোর অধিকার মানুষের রয়েছে। রাষ্ট্র গঠন ও 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' সম্পর্কে রুশোর বক্তব্যে স্ববিরোধিতা ছিল। ঐতিহাসিকভাবেও এসব বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে মতভেদ থাকার অবকাশ আছে। কিন্তু রুশো এমন ভাষায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে তা সহজেই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

ভলতেয়ার, মঁতেসকিয়ো এবং রুশো ছিলেন সে যুগের সর্বাধিক খ্যাতিমান দার্শনিক। কিন্তু এ সময়ে আরও কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, কেউ কেউ ছিলেন অর্থনীতিবিদ এবং অন্য কয়েকজন বিশ্বকোষ রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন।

বিশ্বকোষ সংকলকগণ

বিশ্বাকোষ সংকলকদের দলে ছিলেন অংকশাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। এরা নিজ নিজ বিশেষ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের চিন্তা-চেতনা সন্নিবেশ করার জন্যে একটি বিশ্বকোষ রচনার কাজে হাত দেন এবং ১৭৫১ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে ২৮ খন্ড সংকলন করেন। একাজের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন দেনিশ দিদেরো, দ্যালেমবার, দোলবাস ও এলভেতিয়াস। নতুন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গবেষণার ভিত্তিতে রচিত এসব গ্রন্থ জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পাশাপাশি প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলো মানুষের কাছে তুলে ধরে।

ফিজিওক্র্যাট্স

আঠারো শতকের মাঝামাঝি 'ফিজিওক্র্যাট' নামে একদল অর্থনীতিবিদের অভ্যুদয় ঘটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ফ্রাঁসোয়া কেসনে, মিরাবো, তুর্গো এবং নেমুর। এসব অর্থনীতিবিদ দৃঢ়মত পোষণ করেন যে, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃদ্ধি অনুসারে তাকে উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দেয়া উচিত। অর্থাৎ বণিকবাদের প্রভাবে তৎকালে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অবসান করতে হবে। গুরনে এ ধারণাকে বলেছেন 'লেসেফের' (Laeissez-faire) বা অবাধ নীতি অর্থাৎ মানুষ নিজে যেটাকে উত্তম মনে করে সেটাই তাকে করতে দেয়া। এর পাশাপাশি ফিজিওক্র্যাটগণ নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব, যাজক-পুরোহিতদের তান্ত্রিক শাসন-শোষণের অবসান, পদমর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ প্রভৃতি দাবিও পেশ করেন।

সমাজতন্ত্রী চিন্তাবিদগণ

বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিছু লেখক ও চিন্তাবিদ ব্যক্তি-মালিকানা, বিশেষ করে সম্পত্তির মালিকানাকে এর জন্যে দায়ী করেন। অর্থাৎ সামগ্রিক সমস্যাটাকে এরা বিচার করেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এর সমাধানে সাম্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন পরিকল্পনার উল্লেখ করেন। এ মতবাদের অগ্রনায়ক ছিলেন জ্যা মেসলিয়ে নামক একজন যাজক। তিনি বলেন ''অসমতা প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী। প্রকৃতি সবাইকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছে। সবার বাঁচার সমান অধিকার রয়েছে, অধিকার রয়েছে সমানভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করার।" অন্যান্য সমাজতন্ত্রী লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিলেন মরেলি, আবে মাবলি ও মিমোঁ ল্যাংগে।

বুদ্ধিজীবীদের অবদান

ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম করার ক্ষেত্রে দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সেতোব্রিয়াঁ, টেইন, রুস্তান প্রমুখ ঐতিহাসিকদের ধারণা বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। অপরপক্ষে, মার্কসবাদী ঐতিহাসিক যথা লেফেভর, মাতিয়ে,

মর্সস্টিফেন্স সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একথা সত্য যে দার্শনিকদের কেউ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন নি। প্রকৃতপক্ষে ভলতেয়ার, মঁতেসকিয়ো এবং রুশো বিপ্লবের অনেক আগেই মারা যান। এরা সবাই বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের পক্ষেও মত দেন নি। একথাও সত্য যে দেশের সাধারণ মানুষ বুদ্ধিজীবীদের লেখা পড়ে নি। তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষেরও ধারণা ছিল। বুদ্ধিজীবীদের রচনার মর্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন বুদ্ধিজীবীদের মতবাদ শুধু ধ্বংসাত্মক ছিল না, এর একটি গঠনমূলক বা ইতিবাচক দিকও ছিল। অর্থাৎ তাদের লেখনি একদিকে যেমন মানুষকে প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীন করে তোলে, অপর দিকে তেমনি এর বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার ধারণা দেয়। এভাবে দার্শনিকগণ মানুষের বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের চিন্তাজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। ১৭৮৯ সালের বিপ্লব মানসজগতে এ পরিবর্তনেরই ফসল। তাছাড়া দার্শনিকদের অবদান ছিল বলেই এ বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

সারসংক্ষেপ

আঠার শতকে ফ্রান্সে একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে প্রচলিত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যবস্থার, ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসব লেখকের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভলতেয়ার, মতেসকিও ও রুশো। এ ছাড়া একদল লেখক ফিজিওক্র্যাটস নামে পরিচিত, একদল অর্থনীতিবিদ ও কয়েকজন, সামাজতন্ত্রী চিন্তাবিদেরও আবির্ভাব ঘটে। এরা সবাই বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের লেখনী বিপ্লবের পথ সুগম করতে অবদান রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভলতেয়ার কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?

(ক) ১৬৯০ সালে (খ) ১৬৯২ সালে

(গ) ১৬৯৪ সালে (ঘ) ১৬৯৫ সালে

২। রুশো কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) প্যারিস (খ) জেনেভা

(গ) বার্লিন (ঘ) ব্রাসেলস

৩। ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশ্বকোষের কত খন্ড প্রকাশিত হয়?

(ক) ২৮ (খ) ২৬

(গ) ২৫ (ঘ) ২০

৪। মঁতেসকিয়ো কত দিন ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন?

(ক) প্রায় তিন বছর (খ) প্রায় আড়াই বছর

(গ) প্রায় দুই বছর (ঘ) প্রায় দেড় বছর

খ. রচনামূলখ প্রশ্ন

১। ভলতেয়ার, রুশো, ও মঁতেসকিয়োর মতামত আলোচনা করুন।

২। ফিজিওক্র্যাটস ও সমাজতন্ত্রী লেখকদের বক্তব্য কি ছিল?

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মঁতেসকিয়োর ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। রুশোর প্রাথমিক জীবন আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Robert Ergang. Europe From Renaissance to Waterloo
2. A. Salvemini, The French Revolution. 1789-1792
3. C. g. H Hayes, A Political and Cultural History of Modern Europe.